জঙ্গিদের দখলে বাংলাদেশ

দায়ী খালেদা - হাসিনা

আহসান কবির

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখ দেশে নাশকতা ঘটতে পারে এটা তিনি জানতেন। আসলে আগস্ট মাসের অনেক কিছুই আমরা জানি। যেমন- ১৯৪৫ সালের ৬ এবং ৯ আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটমবোমার বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিলো লাখো মানুষ। ১৯৪৬ সালের ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট এই তিন দিনে কলকাতায় মেরে ফেলা হয়েছিল ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষ যা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামেই পরিচিত বা কুখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। গত বছরের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় মারা যান আইভি রহমানসহ ২২ জন। এ বছর ১৪, ১৫ ও ১৬ আগস্ট সারা দেশের ৬৩টি জেলায় একসঙ্গে যতগুলো বোমা ফেটেছে, সারা পৃথিবীর কোনো দেশে কখনোই সেটা ঘটেনি। আগস্টকে ঘিরে এতো সব ঘটনা ঘটবে হয়তো স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও জানতেন। তবে ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখে স্পেশাল কী ধরনের নাশকতা ঘটতে পারতো সেটা তিনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারতেন। যেহেতু এ তিন দিন কিছুই ঘটেনি, তারপর কি তিনি দলবলসহ (এনএসআই, ডিজিএফআই, এমবিডিবি পুলিশ, র‌্যাব ইত্যাদি) ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? ঘুম কি ভেঙেছিল তার বা তার দলের বোমা হামলার শব্দে?

আমাদের এতো সব জেনে লাভ নেই। তবে আমরা এটুকু ভেবে খুশি হতে পারি যে, 'স্টিল হি ইজ লুকিং ফর শত্রুজ!' সান্ত্বনা আরো আছে। সারা দেশের মানুষের কাছে ভীতি উদ্রেগকারী এই বোমা হামলার পর মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'ইটস এ টোটাল ফেইলিওর!'

গোয়েন্দা

গোয়েন্দা কাহিনী খুবই উপভোগ্য। গোয়েন্দা বা থ্রিলার ছবি, জেমস বন্ড এমনকি সত্যজিতের ফেলুদাকে নিয়ে বানানো ছবিগুলোও খুব মজাদার। এ দেশে মাসুদরানা, তিন গোয়েন্দাও কম জনপ্রিয় নয়। তো এসব দেখে এক গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধানকে জিজ্ঞাসা করা হলো- আচ্ছা আপনাদের তো লাইফ রিস্ক। ছবিতে বা গল্পে দেখা যায় চোর, ডাকাত, বোমাবাজ কিংবা ভিলেনরা কতো পাক্কা। আপনাদের তো কম মাথা ঘামাতে হয় না। তাই না?

গোয়েন্দাপ্রধানের উত্তর ছিল- না না, সিনেমায় তাদের যতো বুদ্ধিমান মনে হয়, তারা আসলে ততো বুদ্ধিমান নয়। ঠিক যেমন আমরা অর্থাৎ গোয়েন্দারা!

দিন পাল্টেছে। গোয়েন্দারা আগেও যেমন বুদ্ধিহীন ছিলেন, হয়তো এখনো তেমনই আছেন। কিন্তু কয়েক গুণ বেশি বুদ্ধি নিয়ে আজ যারা আধঘন্টার মধ্যে সারা দেশের ৬৩টি জেলায় একসঙ্গে বোমা ফাটাতে পারে, তাদের কী উপাধি দেয়া যায়? নাকি আগেই তাদের নাম দেয়া হয়েছিল? 'জঙ্গি' তাদের নাম?

জঙ্গি

১৯৭১ সালের পরে এ দেশে ধর্মআশ্রিত কিছু রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে 'আন্ডারগ্রাউন্ড' খ্যাত কিছু বাম সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৭ সালে সামরিক শাসনামলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজ স্বার্থেই পুনর্জীবন দেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

‘জামায়াতে ইসলামী দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে’

ফজলুল হক আমিনী

দেশজুড়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনায়। মৌলবাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম ব্যক্তি মুফতি ফজলুল হক আমিনী। তিনি এক সময় বলেছেন, বাংলা ভাই বলে কেউ নেই। এখন বলছেন, জামাআতুল মুজাহিদিন বলে কিছু নেই। তার যখন যা মনে হয় সেটাই বলেন। কেন বলেন, কিসের ভিত্তিতে বলেন তার কোনো কার্যকারণ থাকার দরকার হয় না।

ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের প্রধান ফজলুল হক আমিনী গত ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে কথা বলেছেন। কথোপকথন ছিল এ রকম...

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজেদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : মিডিয়ায় আপনার নাম এলে কেমন লাগে?

ফজলুল হক আমিনী : মিডিয়ায় নাম আসার ব্যাপারটি অনেকে বড় চোখে দেখে। কিন্তু আমি তেমন মূল্য দিই না। তবে হ্যাঁ, নিজের নাম ছাপা হলে খারাপও লাগে না। আরো ভালো লাগে যারা চিনতো না, তাদের কাছেও পরিচিত হয়ে পড়ি। তবে আমার ব্যাপারে যত কুৎসাই ছড়ানো হোক না কেন, মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

২০০০ : আপনার ব্যাপারে কোন কুৎসাটা বেশি ছড়ায় মিডিয়া?

আমিনী : আমি নাকি ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠন করি।

২০০০ : এটাকে আপনি কুৎসা বলছেন...?

আমিনী : আলবৎ। আমি দীন আহকামের কথা বলি। একজন মুমিন মুসলমান কাকে বলে আপনি জানেন না? ধর্মীয় উন্মাদনা হয়ে যায় মানুষকে নামাজের কথা বললে, কোরআন পড়ার কথা বললে, দীন কায়েমের কথা বললে।

২০০০ : আপনার সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সব থেকে বেশি ‘উগ্র’ বলা হয় আপনাকে।

আমিনী : কথাটা ঠিক নয়। ‘উগ্র’ শব্দটা আমার ওপর আরোপ করাটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আপনাকে কারা বলেছে আমি সব থেকে উগ্রবাদী? দেশের অন্য ইসলামী দলগুলোর মধ্যে আমরা সব থেকে জনপ্রিয়। আমাদের তাগদ বেশি। জামায়াতে ইসলামী দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে। তারাই আমাদের ব্যাপারে বেশি কুৎসা রটায়। আর ইসলামবিরোধী শক্তি সেটাকে প্রশ্রয় দেয়। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি বা আমার দল কোনো প্রকার উগ্রবাদী সংগঠনের চর্চা করি না। এটা কুচক্রীমহলের প্রচারণা।

২০০০ : জামাআতুল মুজাহিদিন দেশে সিরিজ বোমা ফাটালো...

আমিনী : ‘জামাআতুল মুজাহিদিন’ নামের যে দলের কথা বলছেন, এ দলটি নিয়েই আমার সংশয় আছে। যে মহল আমাদের উগ্র সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়, তাদেরই এই কাজ। কারণ জামাআতুল মুজাহিদিন নামে কোনো দল বা গোষ্ঠী দেশে নেই।

২০০০ : কীভাবে বললেন, জামাআতুল মুজাহিদিন দেশে নেই?

আমিনী : আমরা ময়দানে আছি। আমরা জানি কারা কি করছে, কীভাবে দল তৈরি হচ্ছে আমাদের কাছে সে সংবাদ আসে।

২০০০ : আপনাদের কাছে খবর আসে! একটু বুঝিয়ে বলবেন?

আমিনী : আরে ভাই আপনি তো কথাই বলতে দেন না। বলছি

তখন ব্যাঙের ছাতার মতো কিছু রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে যার অধিকাংশই ছিল ধর্মনির্ভর। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে এ দলগুলোর কয়েকটি মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ‘সাহায্যদাতা’ ম্যানেজ করতে সক্ষম হয়। এরশাদের শাসনামলে এই মধ্যপ্রাচ্য কানেকশন অনেক ডালপালা বিস্তার করে। বিদেশী অর্থ সাহায্যে মসজিদ-মাদ্রাসা গড়ে তোলা, সেই সঙ্গে মাদ্রাসানির্ভর সংগঠন গড়া তখন শিল্পে পরিণত হয়। মুক্তিকামী কাশ্মীরিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বর্তমানে যিনি বিহারে একটি মাদ্রাসা চালান, সেই আব্দুল মতিন সালাফিকে এরশাদ আমলেই দেশছাড়া করা হয়। এই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকজন সে সময়েই আহলে হাদিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আফগানিস্তানে রাশিয়ান আগ্রাসনের সময়ে মুজাহিদিনদের আমেরিকাই সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিল। ওসামা বিন লাদেন কিংবা তালেবানদের জন্ম সে সময়। বোমা হামলার ঘটনায় বাংলাদেশে আবারও আলোচনায় আসা আব্দুর রহমান, মুফতি হান্নানরা সে সময় আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন যুদ্ধ করতে। বাংলাদেশের ৩৩ জন যোদ্ধার কবর রয়েছে আফগানিস্তানে, যার মধ্যে একজন ছিলেন হাফেজ্জী হুজুরের নিকটাত্মীয়। গত বিএনপি আমলের প্রথম

দিকে দেশে ফিরে আসা এই কথিত ‘আফগান যোদ্ধারা’ তখন হরকাতুল জিহাদ নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেয়। অস্ত্রসহ প্রশিক্ষণের সময় ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার পাইনখালী গ্রাম-সংলগ্ন লম্ভখালীর জঙ্গলে ৪১ জন হরকাতুল জিহাদ সদস্য সেনাবাহিনী ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এদের গ্রেপ্তার করে জেলে নেয়া হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হয় তাদের। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে এসব জঙ্গি জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসে। সে সময় এ জঙ্গি কাহিনী গোয়েন্দামহলে ব্যাপক তোলপাড় তুললেও সরকারি সিদ্ধান্তে তারা আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। একটি সূত্র জানিয়েছে, এরপর এই জঙ্গিরা আহমেদ

জামায়াত নেতা সাঈদীর ঘনিষ্ঠজন কথিত খুলনার আন্ডারগ্রাউন্ড জনযুদ্ধের ক্যাডার শিহাব ও সুমনের ভাই কামরুলকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করলেও তাকে মারা হয়নি। একইভাবে বাংলা ভাইকেও দুবার ছেড়ে দেয়া হয়

শরীফ, শামসুর রাহমান, তসলিমা নাসরিনসহ অনেককে মুরতাদ ঘোষণা করে। সিলেটে এ সময়ে শামসুর রাহমানের সফর নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীকালে তসলিমা নাসরিনকে নিয়েও এমন ঘটনা ঘটে। কিন্তু প্রশিক্ষণ কিংবা বোমাবাজির ঘটনা নিয়মিত বিরতিতে ঘটতে থাকে আরো কিছুদিন পর থেকে।

জামাআতুল মুজাহিদিন কিছু না। সব সাজানো। সারা দেশে বোম রাখার মানুষ ওদের আছে নাকি? এতো লোক কোথায়। আর টাকারও তো একটা ব্যাপার আছে।

২০০০ : ওদের সম্পর্কে আপনি এতো জানেন?

আমিনী : আমার মনে হয় এই ইন্টারভিউ এখানেই শেষ করা উচিত। আপনি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলতে এসেছেন। আপনারা শুনবেন একটা আর লিখবেন আরেকটা। আমি আর কোনো কথাই আপনাকে বলবো না।

> 'জামাআতুল মুজাহিদিন' নামের যে দলের কথা বলছেন, এ দলটি নিয়েই আমার সংশয় আছে। যে মহল আমাদের উগ্র সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়, তাদেরই এই কাজ। কারণ জামাআতুল মুজাহিদিন নামে কোনো দল বা গোষ্ঠী দেশে নেই

২০০০ : আপনি রাগ করছেন?

আমিনী : না, আমি রাগ করিনি। কিন্তু আপনি যেদিকে চলতে চাইছেন, আমার সেটা পছন্দ হচ্ছে না। ভালো হয় ইন্টারভিউ স্টপ করে দেন। আমি যদি জঙ্গি গ্রুপ হতাম তাহলে সরকার-প্রশাসন আমাদের ছাড়তো? গোয়েন্দারা চারপাশ দিয়ে ওঁত পেতে আছে। আমাদের মাদ্রাসার ছেলেদের একটু হলেই নাজেহাল করে। ইসলামের ওপর দুর্বার আক্রমণ চালাচ্ছে। দুনিয়াজুড়েই চলছে।

২০০০ : আপনি ইন্টারভিউ দিতে না চান, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু লোকে আপনার সম্পর্কে যা বলে সেটাও মনে হয় আমার জেনে রাখা দরকার।

আমিনী : কী বলে আমার সম্পর্কে? বলার কী আছে? দালালরা কে কি বললো, সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী আছে?

২০০০ : দেশে যে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে তাতে আপনারাও জড়িত থাকতে পারেন বলে অনেকে মনে করছে।

আমিনী : আপনাকে তো আগেই বলছি, মিডিয়া কি বললো তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। সিরিজ বোমা যারা করছে তারা আমাদের ভালো চায় না। আমরা এর প্রতিবাদ জানাই। আমাদের দলের সম্পৃক্ততার কথা যাই বলেন, এটাই সত্য। জামাআতুল মুজাহিদিনের সঙ্গে আমাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। দেশ থেকে যারা ইসলাম উৎখাত করতে চায় তারাই কথায় কথায় ইসলাম ও ইসলামী দলকে মন্দ বলে।

২০০০ : আপনার সম্পর্কে আরেকটি অভিযোগ আছে বলবো?

আমিনী : বলেন।

২০০০ : আপনার অধীনে সারা দেশে তিন শতাধিক মাদ্রাসা আছে। এই মাদ্রাসাগুলোতে উগ্র জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দরিদ্র শিশুদের দিয়ে ধর্মের নামে রাজনৈতিক চর্চা করে থাকেন?

আমিনী : শোনেন, এগুলো হলো রটনা। আমাদের বিরুদ্ধে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী কুৎসা রটাতে চাচ্ছে। দেশগ্রামে যান, দেখবেন আমাদের লোকজন কেমন মান্য করে। দেশের মানুষ চায় দেশে ইসলামী শাসন চালু হোক। তারা দলে দলে সংগঠিত হচ্ছে। ওইসব জালেম-মুরতাদদের বিরুদ্ধে দেখবেন দেশের মানুষ প্রতিরোধ করবে। তাদের দেশ থেকে বের করে দেবে।

২০০০ : জামাআতুল মুজাহিদিন দেশে নেই কথাটা বলছেন। এক সময় বলা হতো বাংলা ভাই বলে কিছু নেই। কিন্তু দেখা গেলো বাংলা ভাই ঠিকই আছে। জামাআতুল মুজাহিদিনকে এমনভাবে দৃষ্টির আড়াল করতে চাইছেন না তো?

আমিনী : আপনি যা বোঝাতে চাইছেন তা বুঝেছি। তবে এখন আর আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না। ইন্টারভিউ শেষ করেন।

হরকাতুল জিহাদ

হরকাতুল জিহাদ আবার আলোচনায় চলে আসে গত আওয়ামী লীগ আমলে। প্রথমে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে তাদের ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ। এরপর রমনার বটমূলে, খুলনার কাদিয়ানি মসজিদে, নানিয়ারচরের গির্জায়, মাজারে বোমা মেরে এরা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তখন হরকাতুল জিহাদের নামে আওয়ামী লীগ সরকারের অভিযোগকে অনেকেই আমলে নেননি। অনেকেই মনে করতেন, মানুষের সিমপ্যাথি আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার কোনো না কোনোভাবে এসব বোমা হামলা ঘটাচ্ছে। বিএনপি এসব প্রতারণার মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মানুষকে এ কথা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছিল যে, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা আনার মতো আওয়ামী লীগ এখনো ধর্মপ্রাণ মানুষ বা তার সংগঠনসমূহকে পছন্দ করে না। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার কিংবা মাদ্রাসায় জঙ্গি সন্দেহে পুলিশের হামলায় তখন অনেকেই নাখোশ হয়েছিলেন। তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপি এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে, এ দেশে জঙ্গিদের কোনো অস্তিত্ব নেই। সবই আওয়ামী লীগ নেতা-মন্ত্রীদের উর্বর মাথার তৈরি। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের আমলে ঘটা অন্তত আট-আটটি বড় বোমা হামলার ঘটনায় মূল আসামিকে

ড. গালিব, আব্দুর রহমান, মুফতি হান্নান ও বাংলা ভাইরা মিলে জামাআতুল মুজাহিদিনের ব্যানারে কাজ শুরু করেন। এ সময় ড. গালিবের নেতৃত্বাধীন আহলে হাদিস যুবসংঘের ওপর ভর করেই দ্রুত সাংগঠনিকভাবে বাড়তে থাকে জামাআতুল মুজাহিদিন

চিহ্নিত করতে পারেনি। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেনি যে এসব মৌলবাদী জঙ্গিদেরই কাজ। অনেকে মনে করে থাকেন আওয়ামী লীগ আমলের শেষ দুই বছরে বড় বড় বোমা হামলার ঘটনায় মৌলবাদী জঙ্গিদের ওপর নজর গেলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনেকেই মানা করেছিলেন। এর কারণ এদের ভোটব্যাংক। দেশের লাখ লাখ মাদ্রাসার অগণিত ভোটারদের সমর্থন হারাতে চায়নি আওয়ামী লীগ। কিন্তু তাদেরকে তারা ব্যবহারও করেনি। উল্টো প্রচার মাধ্যমে তাদের দায়ী করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ তার এই কৌশল কাজে লাগাতে পারেনি। বোমা হামলার সুষ্ঠু বিচারও সে সময় হয়নি, উল্টো নির্বাচনে তাদের ভয়াবহ ভরাডুবি ঘটে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে আসে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, বিজেপি ও ইসলামী ঐক্যজোট। মৌলবাদী জঙ্গিদের ভেতরে (?) ভেতরে (?) সমর্থন এরপর বিএনপির জন্যও কাল হয়ে দাঁড়ায়।

জামাআতুল মুজাহিদিন

আহলে হাদিসের জন্ম ব্রিটিশ আমলেই। এরা মূলত ধর্মীয় রাজনীতি করলেও উগ্রতা

কখনো এই সংগঠনকে নাড়া দিতে পারেনি। ব্যক্তিগত জীবনে দারুণ সৎ, ধর্মীয় আচার-আচরণ মনে-প্রাণে মেনে নেয়া এ দেশের অগণিত লোক কিন্তু আহলে হাদিসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। এটা ছিল তাদের গর্ব। কারণ জামায়াতে ইসলামীর মতো যুদ্ধ অপরাধী সংগঠন কিংবা ইসলামী ঐক্যজোটের অনেক বিতর্কিত নেতাদের মতো এই সংগঠনের নেতারা বিতর্কিত ছিলেন না। তবুও ১৯৭১ সালে এসে এদের ভিত নড়ে যায় খানিকটা। মুক্তিযুদ্ধের পর আহলে হাদিসের প্রধান হন ড. আব্দুল বারী। মূলত উগ্রপন্থা নিয়েই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০২-এর মধ্যে আহলে হাদিস দলটি চার-চারবার ভেঙে যায়। নিছক ধর্মীয় আচার ও সৎ জীবন যাপনের মানুষরা হারিয়ে যেতে থাকেন। আহলে হাদিসের ফ্রন্ট লাইনে চলে আসেন ড. গালিব, আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাইয়েরা।

হরকাতুল জিহাদ ১৯৯২ সালে গঠিত হলেও ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের ৪১ জন সদস্য ধরা পড়লে তারা বড় ধরনের ইমেজ সংকটে পড়ে। এরপর শামসুর রাহমান হত্যা প্রচেষ্টা মামলাসহ বড় ধরনের বোমা হামলার ঘটনায় তারা সংগঠনের নাম বদলে ফেলেন। ড. গালিব, আব্দুর রহমান, মুফতি হান্নান ও বাংলা ভাইরা মিলে জামাআতুল মুজাহিদিনের ব্যানারে কাজ শুরু করেন। এ সময় ড. গালিবের নেতৃত্বাধীন আহলে হাদিস যুবসংঘের ওপর ভর করেই দ্রুত সাংগঠনিকভাবে বাড়তে থাকে জামাআতুল মুজাহিদিন। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জামাআতুল মুজাহিদিন প্রথম সশস্ত্র অপারেশনে নামে। নদীপথে তারা সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানার রাঙ্গুনীবাড়ি পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালায়। চার পুলিশকে হত্যা ও পাঁচজনকে আহত করে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

হরকাতুল জিহাদের কিছু সদস্য ১৯৯৬ সালে ধরা পড়ার পর তারা ক্রমশ নিজেদের চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল থেকে গুটিয়ে আনতে থাকে। এ দেশের দরিদ্রপ্রধান এলাকাই হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাজের প্রধান আশ্রয়স্থল। তারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাদের কার্যক্রম গড়ে তুলতে থাকে। বিদেশ থেকে এনজিওর নামে ১৯৯৩ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত শত কোটি টাকা আনা হয়। ইসলামে প্রসার, প্রচার ও মসজিদ নির্মাণের নাম করে এ দেশে ড. গালিব, আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইদের যে এনজিওরা সাহায্য করতো তারা হলো আরআইএইচএস (রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি অব কুয়েত) আল হারমাইন ও তাইবাহ ইন্টারন্যাশনাল। এই তিনটি সংগঠন

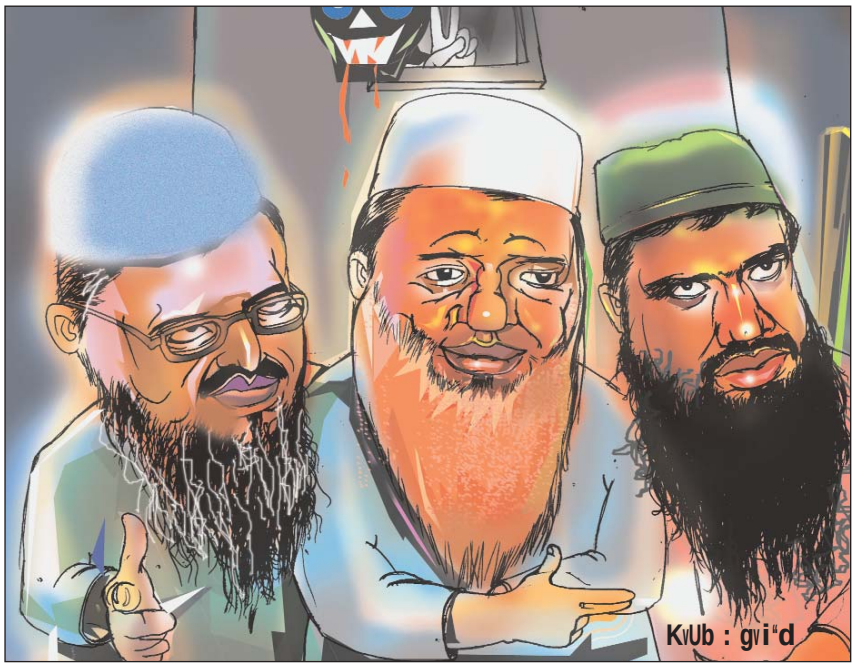

বোমা হামলার ঘটনায় বাংলাদেশে আবারও আলোচনায় আসা আব্দুর রহমান, মুফতি হান্নানরা সে সময় আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন যুদ্ধ করতে। বাংলাদেশের ৩৩ জন যোদ্ধার কবর রয়েছে আফগানিস্তানে, যার মধ্যে একজন ছিলেন হাফেজ্জী হুজুরের নিকটাত্মীয়। গত বিএনপি আমলের প্রথম দিকে দেশে ফিরে আসা এই কথিত 'আফগান যোদ্ধারা' তখন হরকাতুল জিহাদ নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেয়

পৃথিবীব্যাপী আল-কায়েদাকে অর্থ সাহায্য করে বিধায় পৃথিবীর অনেক দেশেই তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। সোমালিয়া, আলবেনিয়া, পাকিস্তান, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, বসনিয়া ও বাংলাদেশে এদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। আল হারমাইনের সাত সদস্যকে এ দেশে গ্রেপ্তার করার পর নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এনাম অরনেটের প্রতিষ্ঠান বেনোভেলেন্স ইন্টারন্যাশনাল এ দেশে ১৯৯২ সালে এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করতো। ঢাকায় এ সংস্থার প্রধান ছিলেন মি. তাহা। আমেরিকায় নাইন ইলেভেনের হামলার পর সংস্থাটির কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বাংলাদেশে রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ অব কুয়েতের অফিস উত্তরার লেক ড্রাইভ রোডে। এখনো এ দেশে অনেক এনজিওর নামে বৈধভাবে কাগজপত্র না নিয়ে বহু মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিক এ দেশে অবস্থান করছেন।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম থেকেই জঙ্গি বা ইসলামী মৌলবাদীদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। এমন কি যারা এসব নিয়ে লেখালেখি করতেন তাদেরকে অদেশপ্রেমিক বানানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। একাধিকবার এ সরকারের নেতা মন্ত্রীরা বলেছেন এ দেশে জঙ্গিদের অস্তিত্ব নেই। বাংলা ভাই বলে কারো নাম তাদের জানা নেই। জামায়াতে ইসলামীর দুই মন্ত্রী তো বারবার বলেছেন বাংলাভাই নাকি একটি দৈনিকের সম্পাদকের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে পয়দা হয়েছে। ১৭ আগস্টের বোমা হামলার পর এখন ক্ষমতাসীনদের কেউ আর কিছু বলছেন না। শুধু স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন 'ইটস এ টোটাল ফেইলিওর।'

ফেইলিওর অব ...

আগেই উল্লেখ করেছি, গত আওয়ামী লীগ আমলে মৌলবাদী জঙ্গিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা না দিলেও এদের প্রতি একরকম 'সফট ফিলিংস' দেখানো হয়েছিল। কারণটা ভোটের রাজনীতি। কিন্তু বোমা হামলার বিচার না করা আওয়ামী লীগ ভোটের রাজনীতিতেও সুবিধা করতে পারেনি।

এরপর কাজে কর্মে, বক্তৃতা বিবৃতিতে জঙ্গিদের আড়াল করার চেষ্টার ফাঁদে সরকার নিজেই ধরা দিয়েছে। সরকারের বার বার অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তারা মাথাচাড়া দিয়ে

উঠছে। সাংগঠনিক অগ্রযাত্রা মোটামুটি শেষ করার পর সারা দেশে তাদের নেটওয়ার্কের প্রমাণ দিয়েছে। এর আগেও সিনেমা হল, ভালোবাসা দিবস, শাহজালাল (রহঃ)-এর মাজারে বোমা মেরে তারা সতর্ক সংকেত দিয়েছিল। কিন্তু সরকার কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে?

হ্যা, সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, সাতক্ষীরা, নাটোর এমনকি ঢাকায় যখনই জঙ্গিরা কোনো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে, সরকার বা পুলিশ তাদের ধরে রাখতে পারেনি। এ পর্যন্ত বাংলা ভাই দুবার ধরা পড়েছিল। পুলিশ তাকে ধর্মীয় 'বুজুর্গ ব্যক্তি' দেখিয়ে জামিন পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। খোদ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। ড. গালিব গ্রেপ্তার হলেও তাকে আটকে রাখার মতো কোনো মামলায় জড়ানো হয়নি। হয়তো এক সময় তিনি জামিন পেয়েও যেতে পারেন। গত ৪ বছরে বিভিন্ন ঘটনায় জামাআতুল মুজাহিদিনের কমপক্ষে ১০১ জন কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিল। এদের ৯৯ জনই ছাড়া পেয়ে গেছে। এদের অধ্যাত্মিক নেতা আব্দুর রহমানও গত আমলে একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সেও জামিনে ছাড়া পেয়ে গা ঢাকা দেয়। কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে :

এই বোমা হামলার শেষ কোথায়

এক. জামাআতুল মুজাহিদিন অব বাংলাদেশ (জেএমজেবি) কিংবা জাগ্রত মুসলিম জনতার প্রায় সব ক্যাডার বা নেতা একসময় জামায়াত বা শিবিরের সদস্য ছিলে। পরে জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা এ কাজে নেমেছে, নাকি এটা কোনো কৌশলের অংশ তা আদৌ নির্ধারণ করা যায়নি। জামায়াত এখন সরকারের অংশ।

দুই. এ দেশে কওমি মাদ্রাসার অনেক ছাত্র, নেতা বা ইসলামী সংগঠনের কর্মী আছেন যারা জামায়াতবিরোধী। এরা কয়েক ভাগে বিভক্ত ইসলামী ঐক্যজোট, নির্দিষ্ট এলাকার পীর বা গোষ্ঠীবিশেষ ধর্মীয় নেতাদের অনুসারী। জামাআতুল মুজাহিদিনের অনেক সদস্যেরই এসব সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এদের শতকরা ৯০ ভাগ বর্তমান সরকারের সঙ্গে আছে।

তিন. গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা কোনো না কোনো বাহিনী অর্থাৎ কোনো প্রশিক্ষিত অংশের সঙ্গে এক সময় আন্ডারগ্রাউন্ড বাম বা

বিস্ফোরিত বাংলাদেশ

'মৌলবাদের উত্থান' কথাটি আর নতুন নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই মৌলবাদের বিষবৃক্ষ যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে তা এক কথায় ভয়াবহ। এরা বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টিই শুধু করছে না, বিপর্যস্ত করছে সাধারণ মানুষের প্রাণ। অসহায় সাধারণ মানুষ উগ্র এই মৌলবাদের নখের আঁচড়ে ছিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই অবস্থার জন্য দায়ী কে?

এ প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে বলতেই হয় আমাদের দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা আছেন, ছিলেন তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বর্তমান এই বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা। উগ্রবাদের উত্থানের ব্যাপারে দেশের কোনো সরকারই কম দায়ী নয়। যুদ্ধোত্তর রাজাকার আলবদরদের নিঃশর্তে ক্ষমা করা, জিয়া সরকার কর্তৃক বহু দলীয় গণতন্ত্রের নামে জামায়াতকে রাজনীতি করার অনুমতি দান। সেই সঙ্গে গোলাম আযমকে দেশে প্রবেশের অনুমতি। স্বৈরাচার এরশাদের সময় শিক্ষালয়গুলিতে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকে বাগে রাখতে ছাত্র শিবিরকে প্রশ্রয় দান, পীরদের জন্য বিশেষ অনুদান, আশ্রয় ইত্যাদি অনুকূল পরিবেশে মৌলবাদী শক্তিগুলো ক্রমে হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্রমশ তারা সরকারি জান্তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করেছে। আমরা অবাক হই, বিস্মিত হই, হতাশ হই, আওয়ামী লীগের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী দল জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বিএনপি, জাতীয়পার্টি জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করবে বা করছে এতে খুব বেশি অবাক বা বিস্মিত হওয়ার কিছু না থাকলে বলা যায়, তারাও দেশের মানুষের ধর্মীয় বোধকেই উপজীব্য করে রাজনীতি করছে। স্বাধীনতা-উত্তর দেশের মৌলবাদের উত্থানের সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজশাহী অঞ্চলের জাগ্রত মুসলিম জনতা দলের সৃষ্টি। এর আগেও জঙ্গিরা দেশের মানুষকে তাদের বিষ দাঁত দিয়ে একাধিকবার দংশন করেছে কিন্তু জাগ্রত মুসলিম জনতার বাংলা ভাইয়ের মতো ভয়ঙ্করভাবে নারকীয় কায়দায় আক্রমণ করেনি। বাংলা ভাইয়ের এলাকায় সরজমিন ঘুরে দেখা গেছে ১২ জন মানুষকে সর্বহারার নামে নির্মমভাবে খুন করেছে। দুশ'জনকে হাজার হাজার মানুষের সামনে নির্যাতন করেছে। মসজিদগুলোকে ক্যাম্প বানিয়েছে। সেখানে আরো দেখা যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. গালিব অর্থের সংস্থান করেছে, বাংলা ভাই মাঠে ময়দানে উন্মাদ ষাঁড়ের মতো ছুটে বেড়িয়েছে। অথচ সরকার এক সময় বাংলা ভাইকে ক্রোড়ে লুকিয়ে বলছে বাংলা ভাই নেই। কিন্তু জাগ্রত মুসলিম জনতার কার্যক্রম থেমে না থাকা এবং বাংলা ভাইয়ের স্বদাম্ভিক উচ্চারণ, 'আমি দেশেই আছি', বলার পরও সরকার তাকে কোনোভাবেই খুঁজে পায়নি বা খুঁজে পাচ্ছে না। একইভাবে দেশ জুড়ে যখন সিরিজ বোমার মতো অতি অলৌকিক ঘটনা ঘটল ঠিক তখনই ইসলামি ঐক্যজোটের একাংশের আমির ফজলুল হক আমিনী বলে বসলেন জামাতুল মুজাহেদিন বলে কোনো দল নেই। অস্তিত্বহীন একটা দল ৬৩টি জেলায় ৫ শতাধিক বোমা একদিনে একসঙ্গে ফোটালো, লিফলেট ছড়ালো কীভাবে? এ প্রশ্নের জবাবে আমিনী যেমন খুব স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি তেমনিভাবে আবারো প্রমাণিত হলো, এ উগ্র মৌলবাদীদের চোখের আড়াল করাই হলো এই স্বার্থান্বেষীদের প্রধান লক্ষ্য।

আর একটি বিষয় বলতে হয়, জঙ্গিদের সরকার বহুবার বহু অপরাধের কারণে হাতেনাতে ধরেছে। বাগেরহাটে একবার বাংলা ভাইকে ধরেছিল পুলিশ। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, কোনো এক রহস্যময় কারণে বাংলা ভাই সেদিন ছাড়া পেয়েছিল। একইভাবে বিভিন্ন সময়ে ছাড়া পেয়েছে জঙ্গিরা। দুর্বল অভিযোগনামা, আলামত নষ্টসহ নানা প্রশাসনিক দুর্বলতার ফাঁক ফোকর গলে জঙ্গিরা পার পেয়ে যাচ্ছে। ধরা পড়ছে কিন্তু শাস্তি হচ্ছে না, উল্টো জামাই আদর পাচ্ছে। জঙ্গিরা আগে যতোটা না জঙ্গি ছিল পরবর্তীতে কয়েকগুণ বেশি প্রবল হয়ে জঙ্গি তৎপরতায় অংশ নিচ্ছে। যে জঙ্গিরা আগে একটি বা দুটি স্থানে আক্রমণ চালাতো, সেই তারাই স্পর্ধা পেতে পেতে এখন দেশব্যাপী এবং বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করছে।

বিস্ফোরণোন্মুখ এই অবস্থার পরিবর্তন আসবে। বাঙালি প্রতিবাদী সাহসী জাতি। যেকোনো মুহূর্তে তারা জেগে উঠবে, হঠাবে জঙ্গিদের এটা বলা যায় দৃঢ়ভাবে এবং নিশ্চিন্তে। বিস্ফোরিত বাংলাদেশের এই ক্রান্তিকালে এটাই শেষ ভরসা।

এই কথিত মৌলবাদী জঙ্গিদের কঠিন সম্পর্ক ছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হতো। এ কারণেই বাম আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত ব্যক্তিত্ব মোফাখখের চৌধুরীকে ক্রসফায়ারের গল্প সাজিয়ে মেরে ফেলা হয়।

আর জামায়াত নেতা সাঈদীর ঘনিষ্ঠজন কথিত খুলনার আন্ডারগ্রাউন্ড জনযুদ্ধের ক্যাডার শিহাব ও সুমনের ভাই কামরুলকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করলেও তাকে মারা হয়নি। একইভাবে বাংলা ভাইকেও দুবার ছেড়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে তাকে ও তার দলবলকে মিছিল-মিটিং করারও সুযাগ করে দেয়া হয়েছিল।

চার. ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনাকে মৌলবাদী জঙ্গিরা নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। তবে মৌলবাদীরা আওয়ামী লীগ-বিএনিপর প্রশ্রয়েই কোনো না কোনোভাবে বেড়ে উঠেছিল। এটা ফেইলিওর অব শেখ হাসিনা, ফেইলিওর অব খালেদা জিয়া। শেখ হাসিনা হয়তো নিজেদের খানিকটা 'কম পাপী' ভাবতেই পারেন। কিন্তু গত বছরের ২১ আগস্টের পর সরকার থেকে বলা হয়েছিল, এ কাজ আওয়ামী লীগ করেনি। তবু বর্তমান সরকার দিনমজুর জর্জ মিঞাকে দিয়ে নাটক সাজাতে চেয়েছে। এ বছরের ১৭ আগস্ট ভয়াবহ এক সংকেত দিয়েছে জঙ্গিরা। এখন আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে জঙ্গিদের মহীরুহে পরিণত করার দায়ভারটা কীভাবে সামলাবেন খালেদা জিয়া?

পাঁচ. পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান বলেছেন, আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। বিষ খাওয়ার পর আর ভুল স্বীকার করে কোনো লাভ আছে? জঙ্গিদের প্রশ্রয় সমীহ করার পরিণতি কী?

আগামী নির্বাচনে জোট সরকারের ভয়াবহ পতন? কিন্তু এরই মধ্যে যদি দেশটা ইরাক বা আফগানিস্তান হবার পথে পা বাড়ায়, তাহলে কে নেবে দায়ভাগ? খালেদা, না হাসিনা?

...জঙ্গি দেশ

শামীমা বিনতে রহমান

এক. ১৭ আগস্ট, বুধবার দুপুর ১টা থেকে পুরো শহরে আপাদমস্তক কালো পোশাকের পুরুষ র‍্যাব আর কালো কুকুরের আনাগোনা বেড়ে গেল। দুপুরের তীব্র যানজটের রাজধানী তখন হরতালের মতো ফাঁকা। বেশির ভাগ দোকানেরই শাটার নামানো। দু-একটা পান-সিগারেটের দোকান, যাদের শাটার নেই এবং বাসস্ট্যান্ডে কোনো রকমে কোনা বের করে পুলিশকে হাতে রেখে বসে তারাই কেবল রয়ে গেছে। আর কালো কুকুরসহ কালো পোশাকধারীরা একটা কিছু করা উচিত তাড়না থেকে ওসব নিরীহদের আশপাশেই চক্কর দিচ্ছিল। মিরপুরের কাজীপাড়া বাসস্ট্যান্ডে দুপুর আড়াইটায় কালো কুকুরের সন্ত্রাসী খোঁজার তৎপরতায় দোকান ছেড়ে ধড়ফড় করে দৌড়ে পালায় দোকানি। ওই সময় এ দৃশ্য অনেকেই দেখেছে। কিন্তু সবাই তখন লা-জওয়াব। কারণ অবিশ্বাস্য, কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধ্য না হয়ে উপায় নেই। বেলা সোয়া ১১টা থেকে পৌনে ১২টার মধ্যে মাত্র একটি জেলা বাদে সারা দেশে একযোগে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সেটা ছিল এমনই একটি দিন, যেদিন খালেদা জিয়া পাঁচ দিনের সফরে চীন গেছেন, আর তার পরদিন পররাষ্ট্রসচিব হেমায়েত উদ্দিন যাবেন ইসলামাবাদ বৈঠকে। সন্ধ্যায় পরিস্থিতি কিছুটা স্তিমিত হলে বিভিন্ন জায়গার গোলটেবিল, লম্বা টেবিল, চায়ের দোকান, ফুটপাত, মাঝারি রেস্তোরাঁ সব জায়গায় একই আলোচনা- জঙ্গি, বোমা... ভয় আতঙ্ক... স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ১৪ থেকে ১৬ আগস্ট তিন দিনের মধ্যে জঙ্গি আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল বলে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা নিয়ে তার চরম দায়িত্বহীনতার তীব্র সমালোচনা থেকে শুরু করে গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যর্থতা, নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যর্থতায় এসে কিছুটা দম ফেলে, তবে তা চলছে এখনো। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা যতটা বারবার আলোচনায় ফিরে আসছে, কারা এর পরিকল্পক তা আরো বেশি করে আসছে। কারণ পরিকল্পনাকারীরা বরাবরই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। একজন সরকারি কলেজশিক্ষক শাহবাগের আজিজ মার্কেটের আড্ডায় বলেই ফেললেন, 'কারণ সরকার তাদের যত্ন করতে ভালোবাসেন এবং ফুলের টোকা দিতেও আঙুল কাঁপে।'

দুই. সংবাদপত্রে পরিবেশিত তথ্যে জানা যায়, ঢাকায় প্রায় ৩০টি স্পটে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সারা দেশে হয়েছে ৩৫১টি স্থানে। প্রতিটিই টাইমবোমা, যার বেশির ভাগই আদালতপাড়া আর সরকারি প্রশাসনিক ভবনে বিস্ফোরিত হয়েছে। একযোগে বিশাল এ হামলায় মৃতের সংখ্যা ২, আহত দেড় শতাধিক। ১৪ জঙ্গি স্বীকারোক্তি দিয়েছে, এতে নাম বেরিয়ে এসেছে জামাআতুল মুজাহিদিনের। এর প্রধান নেতা শায়খ আব্দুর রহমান। জামালপুরবাসী। আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। প্রতিটি বোমা বিস্ফোরণস্থলে অবশ্য বাংলা ও উর্দুতে যে দুটি লিফলেট পাওয়া গেছে, তাতে জামাআতুল মুজাহিদিনের নামই লেখা ছিল। ফলে সাদা চোখে দেশ কাঁপানো এ বিশাল থ্রেটের কৃতিত্ব এখন তাদের। যদিও তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত। একই সঙ্গে বাংলা ভাই, যিনি তার নিজের সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতার চাইতে বেশি পরিচিত এবং আহলে হাদিসের প্রধান কারাগারে অন্তরীণ ড. আসাদুল্লাহ গালীবের নাম উচ্চারিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। তাদের আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ, লাদেনের ভিডিও প্রাপ্তি, আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ইত্যাদি আলোচিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত চিহ্নিত হওয়া ৪৬টি জঙ্গি সংগঠনের নাম এবং এদের মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক টাকার উৎস সবই বিস্তারিতভাবে সংবাদপত্রে আলোচিত হচ্ছে, আগেও হয়েছে।

তিন. দেশীয় সংবাদমাধ্যমে গত ৫ দিনে এ নিয়ে সংবাদ পরিবেশন আর ব্যাপক

কলাম লেখা, জঙ্গি তৎপরতার নেটওয়ার্ক, পূর্বের প্রায় ২৬টি ভয়ঙ্কর বোমা হামলা, সংগঠনের বিস্তৃতি ইত্যাদি যেমন ফ্রন্ট পেজ, ব্যাক পেজে ব্যাপকভাবে আসছে; তেমনি পরিকল্পনাকারী কে এ প্রশ্ন তুলে খবর বেরুচ্ছে বাইরের কাগজেও। পশ্চিমবঙ্গে কাগজে ব্যাপক সেটা। ১৭ আগস্টের ঘটনা নিয়ে ১৮ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গেও সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠাতেই ৪টা বড় স্টোরি করেছে। লিড তো করেছেই। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র সাক্ষাৎকারও আছে। তাতে তিনি শক্ত ভাষায় স্পষ্ট করে বলেছেন, যা ঘটেছে তা খুবই মারাত্মক। সেখানে ইসলামিক ফান্ডা-মেন্টালিজম একটা জটিল জায়গায় চলে গেছে। বাংলাদেশ এখনো একটা মিলিটারি থ্রেট না হলেও এখন একটা থ্রেট। পাকিস্তান একটা সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলেছে ওখানে। মিসেস গান্ধী এবং নটবর সিংকে জানিয়েছি। 'যা হচ্ছে তা খুবই বিপজ্জনক। ক্রমশ পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে।' লক্ষণীয়, একই দিনে পাকিস্থান থেকে প্রকাশিত ডন পত্রিকায় এত তোলপাড় নেই। একটা সাধারণ সংবাদ পরিবেশন করেছে। ডনের নির্লিপ্ততা বরং 'যা ঘটেছে, স্বাভাবিকই' এরকম ধরনের। অবশ্য ভুল তথ্য হিসেবে ডন দেশের ৬৪ জেলার জায়গায় ৬৫টি জেলা উলেখ করেছে। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত নিন্দা জানিয়েছে। তবে একই সঙ্গে উদ্বেগও প্রকাশ করেছে।

চার. লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের জঙ্গি উত্থানকে তার নিজের দেশে আল-কায়েদার নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও দেশের জন্য থ্রেট ভেবে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (আনন্দবাজার, ১৮ আগস্ট)। এ উদ্বেগের চাইতেও তার কথার বড় ম্যাসেজ হলো বাংলাদেশের জঙ্গি রাষ্ট্রের দিকে মোড় নেয়া। এ সাম্প্রতিকতা থেকে চোখ একটু পেছনে ফিরিয়ে যদি দেখি, গত বছর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস জুনিয়র খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং প্রায় সব মন্ত্রণালয়ে গিয়েই তার উদ্বেগ জানিয়ে এসেছিলেন। তিনি যখন শিক্ষা, ধর্মসহ ওই সময়ে, ওই অবস্থায় তার জন্য কম যাতায়াতযোগ্য জায়গায় গেছেন, তখন সবারই খটকা লেগেছিল। তবু তিনি বাংলাদেশকে যাবার বেলায় 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' হিসেবে বলে বিএনপিসহ সরকারকে বেশ হাসি উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা যখন নির্ধারিত সেশনে সাত দেশের প্রতিবেদন তুলে ধরেন, তখন সেখানে বাংলাদেশকে ইসলামী জঙ্গিবাদ উত্থানের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলে উলেখ করা হয়। এখানে প্রশ্ন নয়, একটা ফাঁক ধরা পড়ে। সেটা হলো জুন মাসে হ্যারি কে টমাস যখন মডারেট মুসলিম কান্ট্রি বলেন, তার আগের মাসে ক্রিস্টিনা রোকা ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে প্রবন্ধ উপস্থাপনে বাংলাদেশকে ঝুঁকিপূর্ণ মৌলবাদী দেশ বলেন। তখন পুরো বিষয়টা সাদা চোখে কেবলই দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এরও মাস দুয়েক আগে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদক এলিজা 'পরবর্তী ইসলামী বিপ্লব কোথায়?' শিরোনামে বিশাল প্রতিবেদনে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করে পুরো প্রতিবেদনের ভেতর তার উত্তর হিসেবে বাংলাদেশকে জানান দেন।

বিস্ফোরণ ঘটানোর সাংগঠনিক ভিত্তি যে জঙ্গিদের আছে, তাতে সন্দেহ নেই, এটা প্রমাণিত। কিন্তু কাজটি কি জামাআতুল মুজাহিদিন একা করেছে? দেশজুড়ে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী সংগঠনের নানা মতধারীরা কি একটি বিষয়ে এক হয়ে নেটওয়ার্ক তেরি করে ঘটনাটি ঘটাতে পারে?

পাঁচ. একযোগে সারা দেশে টাইমবোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর সাংগঠনিক ভিত্তি যে জঙ্গিদের আছে, তাতে সন্দেহ নেই, এটা প্রমাণিত। কিন্তু কাজটি কি জামাআতুল মুজাহিদিন একা করেছে? দেশজুড়ে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী সংগঠনের নানা মতধারীরা কি একটি বিষয়ে এক হয়ে নেটওয়ার্ক তেরি করে ঘটনাটি ঘটাতে পারে? কারণ সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অর্ধশতাধিক জঙ্গি দলের লক্ষ্য একই- ইসলামী শাসন কায়েম করা। যেভাবে একযোগে বিস্ফোরণ ঘটেছে, এতে কার্যনির্বাহী বাহিনী এরাই, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, পরিকল্পনা কার?

ছয়. বাংলাদেশকে নিয়ে পশ্চিমি সুর (বুশ-ব্লেয়ার এবং তাদের ধামাধর) এখন মোহনায় যে গান উৎপন্ন করছে, তা হলো বাংলাদেশ জঙ্গি দেশ। জনমত জরিপে শতকরা আশিভাগ সাধারণ মানুষ বলবে, না এ দেশ জঙ্গি দেশ হতে পারে না। কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৬টি ভয়াবহ বোমা হামলার কোনোটিরই বিচার হয়নি। কালো পোশাকধারী র‍্যাববাহিনী সন্ত্রাসী নির্মূল করার মহান ব্রত নিয়ে নামলেও একজন জঙ্গিকেও ধরতে পারেনি। জঙ্গিদের বিস্তার, টাকার উৎস কোনো কিছুর ব্যাপারেই সরকার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করেনি। বাংলা ভাইকে ধরা নিয়েও অনেক নাটক করেছে সরকার। এর ফলে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ, যে নিজের জীবন, দেশের সুস্থ ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে তার কাছে এটা স্পষ্ট, সরকার এবং পশ্চিমা শক্তি যৌথভাবে বাংলাদেশকে জঙ্গি দেশ হিসেবে আখ্যা দিয়ে আফগানিস্তান বানাতে আগ্রহী। সরকার এখানে সহযোগীর ভূমিকায়। এভাবেই প্রমাণিত যে, এ পর্যন্ত সংঘটিত প্রতিটি বোমা হামলা, উদীচী, রমনা বটমূল, ময়মনসিংহ সিনেমা হল, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা, হবিগঞ্জে কিবরিয়ার জনসভায় হামলা প্রতিটি ঘটনায় সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে। এরপর আমেরিকা, ব্রিটেন থেকে গোয়েন্দা সংস্থা আনে এবং তারা সম্মিলিতভাবে ব্যর্থ হয়। পৃথিবীজুড়ে এখন জঙ্গি দেশ বানানোর 'এসো নিজে করি' হোমওয়ার্ক চলছে।

সাত. প্রথম যেবার রিকশায় ছেলেবন্ধুর সঙ্গে হুড তুলে ফিরছিলাম, গর্হিত অপরাধ বিবেচনায় পুলিশকে ১০০ টাকা দিয়ে নিস্তার পেতে হয়েছিল রোকেয়া সরণির রাস্তায়। সেবার ভেবেছিলাম হুড তুলে যাওয়াটা অপরাধ। এরপর আমার অন্য এক বন্ধু হরতালের আগের রাতে অকারণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার অপরাধে থানায় গিয়ে একরাত থাকতে হয়েছিল জানার পর শুনেছিলাম, হরতালের আগের রাতে পুলিশকে ওপরের নির্দেশে থানা ভরাট দেখাতে হয় উচ্ছৃঙ্খল তরুণ শায়েস্তার নমুনা হিসেবে। পরে টাকা দিয়ে বের করে আনা যায়। আমার তখনকার প্রথম অনুভূতিগুলোতে সরল যে আলাপটা তৈরি হয়েছিল তা হলো, 'ওপরের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে পুলিশ সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করে, আবার টাকা খাওয়ার সুযোগও তৈরি করতে হয়। এটাই নিয়ম। এটা যে নিয়ম না বরং অন্যায় এখন তা পরিষ্কার বুঝি। কিন্তু সেই অনুভূতিই এখন বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি, সেটা হলো ওপরের নির্দেশে সরকার দেশটাকে জঙ্গি দেশ বানিয়ে চলছে...